সেদিনের শিল্পীদের চোখে পঞ্চাশের মন্বন্তর

দায়

শ্রীপান্থ

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

পঞ্চাশের মন্বন্তর : শিল্পীর দায়

বাংলার শিল্পী সাহিত্যিক, কবি ও ভাবুকেরা সেদিন মর্তে নেমে এসেছিলেন। এমন নয়, তাঁরা সকলেই 'শিল্পের জন্য শিল্পের' কারবারি। এমন নয়, গজদন্ত মিনারই ছিল তাঁদের প্রত্যেকের ঘর-বাড়ি। বাংলার সাহিত্যে, বাংলার শিল্পে মানবিকতার একটা ধারা বরাবরই ছিল। ছিল বাস্তবকে মেনে নেবার, দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ আশা হতাশার খতিয়ানকে নানা ভাবে শিল্পে সাহিত্যে আত্মস্থ করার। কিন্তু ১৩৫০ বঙ্গাব্দে তাঁরা মুখোমুখি এমন এক রূঢ় বাস্তবের, যা ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ অদেখা। ১১৭৬-এর বাংলা যেন আবার সেদিন চোখের সামনে। বাঙালি কবি চোখ খুলে সকাতরে দেখলেন, 'আজ তাম্রসীতা উলঙ্গিনী, দুর্ভিক্ষকন্যা আমাদের দেশ।'

দুর্ভিক্ষ এই উপমহাদেশে কোনও অশ্রুতপূর্ব ঘটনা নয়। ইতিহাসবিদরা বলেন, আধুনিক কালে ইংরেজ আমলেই এ দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে কমপক্ষে বাইশ বার। আর 'স্কার্সিটি' বা ব্যাপক অন্নাভাব দেখা গেছে অসংখ্যবার। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর বহু অর্থ ব্যয়ে পাটনার কাছে গড়ে তোলা হয়েছিল বিখ্যাত গোল-ঘর। অভিনব স্থাপত্য। তার গায়ে খোদাই করা বাক্য—'ফর দ্য পার্পিচুয়াল প্রিভেনসান অব ফেমিনস ইন ইন্ডিয়া।' সে কুম্ভ কোনওদিন পূর্ণ হয়নি। অসংখ্য বাঙালির উদরও পুরুষানুক্রমে অপূর্ণ ছিল ইংরেজ শাহেনশাহদের আমলে। ১৩৫০-এর আগেও বার বার থেকে থেকেই কঙ্কালের মিছিল দেখা গেছে বাংলার সবুজ মাটিতে। বলা হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের একমাত্র জীবিত সাক্ষী শিবপুরের কোম্পানির-বাগানের সেই বিশাল বটবৃক্ষটি। বাংলার ঘরে ঘরে আজও কিন্তু অনেক 'আকাইল্যা' 'দুইখ্যা' পুরুষানুক্রমে বহন করে চলেছেন দুঃখ দিনের স্মৃতি। তেরশ' পঞ্চাশের দুঃস্বপ্ন নিশ্চয় তাঁদের মতো আরও অনেক বাঙালির স্মৃতিতে এখনও জীবন্ত, জ্বলন্ত।

তেরশ' পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। এদেশে এবং বিদেশে পঞ্চাশের মন্বন্তর এখনও আলোচ্য, গবেষণাযোগ্য। ইথিওপিয়া, সুদান, সোমালিয়ায় রচিত হচ্ছে কঙ্কালে কঙ্কালে আকীর্ণ একালের সভ্য দুনিয়ার হৃদয়হীনতার ইতিহাস। পঞ্চাশের দশকের চীনের দুর্ভিক্ষ, কিংবা সত্তরের দশকে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের খবরগুলো হয়তো অবশিষ্ট দুনিয়ার কাছে ইতিমধ্যেই ঝাপসা হয়ে এসেছে, কিন্তু তেরশ' পঞ্চাশের বাংলা আশ্চর্য পরমায়ু নিয়ে এখনও বেঁচে আছে। বেঁচে আছে শুধু গবেষকদের অক্লান্ত কৌতূহলবশত নয়, এই দুঃখ-স্মৃতি বাঁচিয়ে রেখেছেন বাংলার মরমিয়া শিল্পী সাহিত্যিক কবি এবং গায়কের দল। উল্লেখ্য, আধুনিককালের দুর্ভিক্ষের ঘটনাবলির তথ্য নানা প্রশাসনিক দলিল দস্তাবেজ বা মহাফেজখানায় রক্ষিত নানা নথিপত্র থেকে পাওয়া যায়, যুগযুগান্তরে দুর্ভিক্ষের ইতিহাস কিন্তু রক্ষা করে এসেছেন লেখক শিল্পী এবং কারিগরেরাই। প্রাগৈতিহাসিক কালে এদেশের দুর্ভিক্ষের যে স্মৃতি তা পরবর্তীকালের মানুষের কাছে বহন করে এনেছে বৌদ্ধ জাতকের নানা কাহিনী। একটি জাতকে এমনকি

বুদ্ধমূর্তি

ক্ষুধার্ত প্রজাবর্গের শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উপাখ্যানও রয়েছে। ঋগ্বেদে ক্ষুধার হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য উচ্চারিত হয়েছে প্রার্থনা মন্ত্র। তবু বলা নিষ্প্রয়োজন, যুগ থেকে যুগান্তরে মৃত্যু ক্ষুধারূপে এই উপমহাদেশে ছায়ার মতো মানুষের পায়ে পায়ে ফিরেছে। এই মৃত্যু কখনও আঞ্চলিক, কখনও তার লক্ষ্য বিশেষ বর্গের অসহায় মানুষ। তৎকালের পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ সাধারণত খরা বন্যা বা পঙ্গপালের হামলার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফল, কখনও যুদ্ধ মহামারী কিংবা প্রশাসনিক ব্যর্থতা ডেকে আনত মৃত্যুর মহোৎসব। তা ছাড়া নিত্য ভিক্ষায় তনু রক্ষার বৃত্তান্ত তো বলতে গেলে ধারাবাহিক। আর, সে উপাখ্যান জন্ম জন্মান্তরের মানুষের জন্য আজও ধারণ করে রেখেছে আমাদের শিল্প সাহিত্য।

"দরিদ্র নিম্নবিত্ত সমাজে বাঙালীর সনাতন দুঃখ কষ্ট লাগিয়াই ছিল ; 'হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্যই উপবাস, অথচ ব্যাঙের সংসার বাড়িয়াই চলিয়াছে', 'ক্ষুধায় শিশুদের চোখ ও পেট বসিয়া গিয়াছে, তাহাদের দেহ শবের মত শীর্ণ', 'ভাঙা কলসীতে এক ফোঁটা মাত্র জল ধরে', 'পরিধানে জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্র, সেলাই করিবার মত সূঁচও নাই ঘরে,' 'ভাঙা কুঁড়ে ঘরের খুঁটি নড়িতেছে, চাল উড়িতেছে, মাটির দেয়াল গলিয়া পড়িতেছে'—এই সব ছবি সমসাময়িক সাহিত্যে দুর্লভ নয়।" বাঙালির ইতিহাসের আদিপর্বের কাহিনী শোনাচ্ছেন নীহাররঞ্জন রায়। মধ্য পর্বেও শুনি একই দুঃখময় জীবন বাংলার দরিদ্র পল্লীতে। সতেরো শতকের কাব্যে নিরন্নের প্রতিকৃতি—"অন্ন-বিপরীত দুঃখ তাম্বুল বিপরীত মুখ/কলেবরে নাহি আচ্ছাদন।/তোর কেনরে শনের দড়ি পরিধান ছেড়া ধড়ি/মাথা তোর ভেদ ভেআঙ্কর।" দারিদ্র কোন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে অন্য এক কবির কলমে তার অবিশ্বাস্য চিত্র—"ভোজনের পাত্র নাই জন্মের কাঙাল।/আমানির তরে ঘরে কুড়্যা ছিলে খাল।" ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের দলিল শুধু হান্টার সাহেব আর বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জন্য রচনা করে রেখে যাননি। মন্বন্তরের প্রত্যক্ষদর্শী কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম রচিত চণ্ডীমঙ্গলের এক অজ্ঞাত লিপিকার ১১৭৭ সালে পুস্তিকায় লিখছেন,—"সন ১১৭৬ সাল মহামন্বন্তর হইল অনাবৃষ্টী হইল সস্বি হইল না কেবল দক্ষিণ তরফ হইয়াছিল আর কোথাও কোথাও জলাভূমে হইলেও টাকায় ১২ সের চালু সাড়ে ছয় পণ চালু সের হইল···। তরি-তরকারি নাস্তি সাক নাস্তি কিছু মাত্রেক নাস্তি এই কথা সর্ত্ত বৎসরের মম্বিসী বলেন আমরা কখন এমন ষুনি নাই, ইহাতে কত কত মম্বিসী মরিল···" ১২৩৫ সাল বা ১৮২৮ সালে আর এক দুর্ভিক্ষের সংবাদ রয়েছে 'সুদাম চরিত্র' নামক পুঁথির পাতায়,—"১২৩৫ সাল যুকবছ্যর দেবাতা বরিসিল না য়তোএব পুতি লিখিলাম কোন কম্ম নাই আর গ্রামের লোক গৈতল জাইতে লাগিল য়তএব চেলে ভাউ চব্বি [স] সের হইল তাহ মেলে নাই আর গ্রামে য়দ্যেখান লোকে অন্য জোটে নাই আর গ্রামের লোক অন্য গ্রাম দিয়া জাই [তে] লাগিল পেটের খাতিরে পলাইতে লাগিল···"

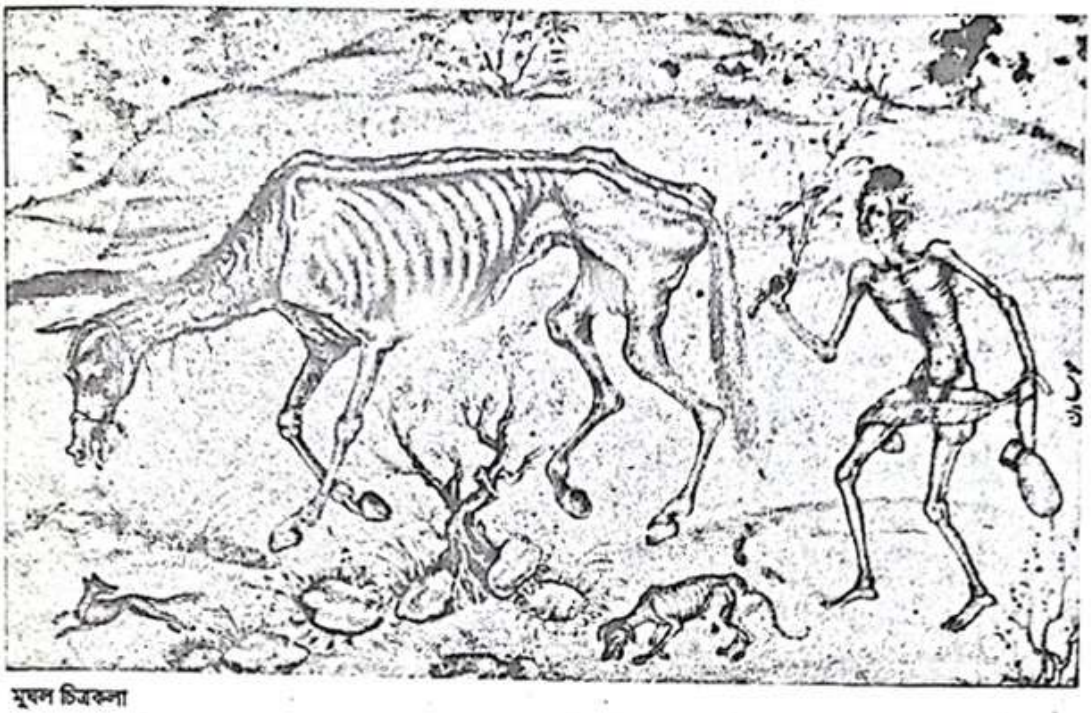

মুঘল চিত্রকলা

সরকারি দলিল দস্তাবেজে, প্রশাসনিক প্রতিবেদনে যখন আকালের অস্পষ্ট বিবরণ লেখা হচ্ছে তখনও কিন্তু কবি এবং কারিগরেরা ছেনি-হাতুড়িতে খোদাই করে রাখছেন চোখে দেখা বিবরণ। মেদিনীপুরের একটি মন্দির লিপিতে এখনও লেখা আছে—"শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ ॥ আদি ॥ সন ১২৭২ সাল/মাঘে পত্তন ॥ অন্ত ॥ ১২৭৫ সাল বৈশাখে কায্য/ সাঙ্গ ও অর্পণ ॥ মধ্যে দুর্ভিক্ষ ১২৭৩ সাল টাকায় তের সের ধান্য ॥ তাতেও কারিগর করেন কর্ম্ম ॥" এই ১২৭৩ বা ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষেই কবি দ্বিজ নফরের কাব্য 'আকাল চরিত্র',—'শ্রাবণে আকালে মাতা হইলেক ঋতুস্নাতা/ভাদ্রে আকাল নিজ মাত্রি গন্তে/আশ্বিনে হোল্য প্রসব তবু না জানে সব/আকাল যে জন্মিল প্রিথেবের ॥"··· ইত্যাদি।

তাই বলছিলাম, বাঙালি কবির কলমে আকাল চিত্র রচিত হয়েছে বার বার। সাহিত্যে দারিদ্র চিত্র যদি নিম্নবর্গের মানুষের প্রতিদিনের দুঃখের কাহিনী বলে, তবে এই সব বিচ্ছিন্ন বাক্য থেকে থেকেই বহন করে আনে একসঙ্গে অসংখ্য মৃত্যুর খবর। ভারতীয় শিল্পেও কিন্তু রয়েছে পাইকারি হারে অনাহার মৃত্যুর কিছু কিছু পরোক্ষ প্রমাণ। লাহোর জাদুঘরে সাজিয়ে রাখা শ্লেট পাথরের উপবাসী বুদ্ধের যে মূর্তিটি গান্ধার শিল্পের অনুপম নিদর্শন বলে গণ্য, তার সঙ্গে বুদ্ধের সাধন কাহিনী অবশ্যই জড়িত। কিন্তু এ বিষয়েও বোধ হয় সন্দেহ নেই যে, খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীর এই মূর্তি যে শিল্পীর সৃষ্টি তিনি ক্ষুধা ক্লিষ্ট মানুষের শীর্ণ বিকৃত অবয়বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। তাছাড়া ক্ষুধাপীড়িতের এই অসাধারণ বাস্তবধর্মী মূর্তি রচনা করা কেমন করে সম্ভব ? ইউরোপে একসময় শিল্পীরা নাকি মানব দেহের অস্থি ও পেশীর সংস্থান বোঝার জন্য কবর থেকে গোপনে মৃতদেহ তুলে কাটাকাটি করে পাঠ নিতেন। আমাদের এই বুভুক্ষপীড়িত দেশে বোধহয় কোনদিনই সে-ধরনের গবেষণার প্রয়োজন ছিল না,—চোখের সামনে কঙ্কালের মিছিল তো লেগেই ছিল ! আমরা জানি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বিহারে। তারপরও এই শিল্পী নিশ্চয়ই কোনও না কোনও দুর্ভিক্ষের সাক্ষী। অন্তত নিরন্ন মানুষের শারীরিক পরিণতি তাঁর অভিজ্ঞতায় নিশ্চয় সঞ্চিত ছিল। এ প্রতিমা সন্দেহ নেই, বাস্তব আর কল্পনার সমন্বয়। ষষ্ঠ শতকের অজন্তার চিত্রাবলীতেও দেখি ভিক্ষাপাত্র হাতে নিরন্নকে। এইসব ভিক্ষাপাত্রধারী ধর্মপ্রাণ শ্রমণ নন, স্পষ্টতই অন্নহীন দীনজন। পরবর্তীকালে মুঘল চিত্রকলায়ও দেখা পাই ওঁদের। ভারতীয় জাদুঘরে বসাওয়ান-এর আঁকা একটি অসাধারণ ছবি রয়েছে। ছবির পেছনে লেখা—'শবিহ্ কাইশ ইবন্ আমীর

উর্‌ফ মজনুন। অ'মল বসাওয়ান।' এ ছবির তারিখ ধার্য হয়েছে ১৫৮৫ সাল। বলা হচ্ছে ছবিটি লায়লার বিরহে ক্লিষ্ট প্রেমিক মজনুর ছবি। নায়কের সঙ্গে তার প্রিয় ঘোড়া এবং কুকুরটি পর্যন্ত কঙ্কালে পর্যবসিত। নীহাররঞ্জন রায় এই ছবিটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে দগ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশে যে বর্ণে চিত্রিত মানুষ, আদরের ঘোড়া এবং পোষা কুকুর আঁকা হয়েছে তা বিচার করলে বুঝতে অসুবিধা নেই এ ছবি একটা প্রকৃত দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির সংবাদই বহন করে আনে। গৃহস্থের কুকুরটি পর্যন্ত যখন খাদ্যাভাবে জীর্ণ, ছবিতে তখন দেখা যাচ্ছে পলায়নপর পুষ্টদেহ একটি শেয়াল। নীহাররঞ্জন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন নায়িকার বিরহে কাতর নায়কের এই প্রতিকৃতি বসাওয়ান আঁকতে পারতেন না, যদি না তিনি প্রকৃত দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে অভুক্ত মানুষ এবং গৃহপালিত পশুর পরিণতির সঙ্গে পরিচিত থাকতেন। তাছাড়া বিরহের প্রথাগত রঙ রীতি কিছুই মানা হয়নি এই মুঘল ছবিতে। ইতিহাসও কিন্তু নীহাররঞ্জনের সিদ্ধান্তের সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ১৫৪০ থেকে ১৫৯০ সালের মধ্যে বেশ কয়েকবার দুর্ভিক্ষ হয়ে গেছে ভারতে। বিশেষ করে উত্তর ভারতে। ১৫৮২ থেকে ১৫৮৪ সালের দুর্ভিক্ষ খাস দিল্লি এলাকায়। বসাওয়ানকে অতএব কাল্পনিক ছবি আঁকতে হয়নি। সত্যি বলতে কী, এক এক সময় মনে হয় হিন্দুর আরাধ্যা কালীর যে কঙ্কালী প্রতিমা তাও কি নিছক সাধক শিল্পীর কল্পনা ? যে দেশে শিল্পে সাহিত্যে অন্নপূর্ণার নামে বিরামহীন কাতর বন্দনা, সে দেশে ক্ষুধা যে মানুষের চিরসঙ্গী সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কঙ্কালী কালী, শ্মশান কালী, রক্ষা কালী, কে জানে হয়তো অন্যভাবে উচ্চারিত অসহায়ের একই প্রার্থনার কথাই বলে। সে প্রার্থনার মর্মকথা—মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ। পরিত্রাণ দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী থেকে। মৃত্যু কখনও কখনও পাইকারি, সেই প্রার্থনা সে সব কারণেই প্রায়শ সর্বজনীন। ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপট যখন ধূসর, বিস্মৃত, ছায়াবৃত অতীতে পর্যবসিত তখন 'আনন্দমঠ'-এর মহেন্দ্র-কল্যাণীর মতো বাংলার শিল্পী লেখকেরা একদিন ভয়ার্ত চোখে সামনে তাকিয়ে দেখলেন, 'তাঁহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।' সেই দুঃস্বপ্ন মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা। বাংলায় সেদিন—তেরশ' পঞ্চাশ।

বাংলার লেখক শিল্পী কবি-ভাবুকেরা সেদিন কী করেছিলেন, কীভাবে বহন করেছিলেন সমাজের প্রতি নিজেদের দায়, সেই গৌরব-কাহিনীর আগে সংক্ষেপে তেরশ' পঞ্চাশের মন্বন্তরের কাহিনী। "একটা ছবি।... রণদানব পাক দিয়ে নাচছে, তার গায়ে লেখা ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩—এইবার সে মাটির দিকে তুড়ি দিয়ে বলছে, এসো এসো। মাটির বুক থেকে উঠছে কঙ্কালসার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, লোলুপ হাঁ-করা প্রায়-নগ্না এক বিভীষিকাময়ী নারীমূর্তি। তার পায়ের তলা থেকে আরও একটি মুখ উঁকি মারছে। সে মুখে আবার চামড়ার আবরণও নেই। সে মহামারী। আকাশে উড়ছে চিল, শকুনি ; গোলা ফাটছে প্লেন উড়ছে, ধোঁয়ায় সূর্য দেখা যায় না, সমস্ত ঝাপসা। নীচে লেখা নববর্ষ—১৯৪৩।" তাঁর সুখ্যাত উপন্যাস 'মন্বন্তর'-এ কোনও এক চিত্রের পরিচিতি লিখছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪৩ বা ১৩৫০-এর মন্বন্তর তেরশ' পঞ্চাশেরই আকস্মিক দুর্যোগ নয়। বস্তুত ১৯৪৩-এর পটভূমি রচিত হয়েছিল সেই ১৯৪১ সালে। বলা চলে আরও আগে, ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে জার্মানি যখন পোল্যান্ড আক্রমণ করে তখন। মাত্র দুদিন পরে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করে জার্মানির বিরুদ্ধে। দামামা বেজে ওঠে। শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। নভেম্বরে স্থির হয় মিত্রশক্তি জার্মানির মোকাবিলায় নিজেদের সর্বসামর্থ সংহত করার উদ্যোগ নেবে। অজান্তে ভারতও জড়িয়ে পড়ে এই যুদ্ধে। কেন না, ভারত ব্রিটেনের বৃহত্তম উপনিবেশ। তার লোকবল এবং আর্থিক সামর্থ তুচ্ছ নয়। এতকাল সাম্রাজ্য লালনে এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পুষ্টি সাধনে কাজে লেগেছে ভারতের সম্পদ ও শ্রম, এবার কাজে লাগাতে হবে সাম্রাজ্য রক্ষায়। ডিসেম্বরে ভারতীয় ফৌজ পৌঁছায় পশ্চিম রণাঙ্গনে। ১৯৪০-এর জুনে শুরু হয় ভারতে বাধ্যতামূলক দক্ষ শ্রমিক সংগ্রহ। ৪১-এর প্রথম দিকে রণাঙ্গন আরও সম্প্রসারিত। মিত্র বাহিনীর সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ায় নাৎসীদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করছে ভারতীয় ফৌজ। যুদ্ধে নতুন মোড়। এই '৪১ সালেই ডিসেম্বর মাসে আবার আরও কর্ণভেদী রণবাদ্য। ডিসেম্বরের ৭ তারিখে জাপান আঘাত হানল পার্ল হার্বারে মার্কিন নৌ-ঘাঁটির ওপর। একই দিনে চীন, মালয়, ফিলিপিনস এবং হংকং-এ জাপানি হামলা। ৮ ডিসেম্বর ব্রিটেনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরাসরি যুদ্ধে নামল আমেরিকা। ১১ ডিসেম্বর ইতালি এবং জার্মানির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করল আমেরিকা। যবনিকা দ্রুত কম্পমান। পশ্চিমের মতো পুবেও শুরু হয়ে গেল মহাযুদ্ধ। একদিকে আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন এবং আরও ২২টি দেশ ; অন্যদিকে তিন ফ্যাসিস্ট

শক্তি—জার্মানি, ইতালি এবং জাপান। তুমুল লড়াই নানা রণাঙ্গনে। আপাত নিস্পৃহ, বিচ্ছিন্নতা ও বিষণ্ণতার কবি বলে সসম্ভ্রমে আদৃত জীবনানন্দ দাশ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন—'চারিদিকে প্রকৃতির' অন্য চেহারা—"চারিদিকে কলকাতা টোকিয়ো দিল্লী মস্কৌ অতলান্তিকের কলরব,/সরবরাহের ভোর,/অনুপম ভোরাইয়ের গান ;/অগণন মানুষের সময় ও রক্তের জোগান/ভাঙে গড়ে ঘর বাড়ি মরুভূমি চাঁদ/রক্ত হাড় বসার বন্দর জেটি ডক ;/প্রীতি নেই, পেতে গেলে হৃদয়ের শান্তি স্বর্গের/প্রথম দুয়ারে এসে মুখরিত করে তোলে মোহিনী নরক।"

কলকাতা তথা বাংলা সেদিন এই নরকেরই অন্তর্গত। মহাযুদ্ধ যখন সুদূরের বার্তার মতো, এই বাংলা মুলুকেই তখনই তার দীর্ঘ ছায়া। দেখতে দেখতে মনের বাঘ বনের বাঘে পরিণত হয়, উৎকণ্ঠার ছায়া বাংলার সবুজ মাটি ছেয়ে ফেলে, আকাশ ঢেকে যায় কালো মেঘে। জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর সে মেঘ আরও ঘনকৃষ্ণ। কারণ, পূর্বাঞ্চলের শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য কলকাতা তথা বাংলা মুলুককে পরিণত করা হয়েছে ফৌজি সাজঘরে। সেনা-ছাউনি, ইতস্তত নানা মাপের ঘাটি, রসদের মজুত ভাণ্ডার—সব মিলিয়ে ব্যাপক প্রস্তুতি। কলকাতা তখন বলতে গেলে এক ফৌজি শহর। এখানে রাত্রে ব্ল্যাক আউট, অপ্রদীপ। দিনে সরোষে মিলিটারি লরির আনাগোনা। তামাটে বাদামি শাদা-কালো নানা রঙের পল্টনের ভিড় এই শহরে। পার্কে পার্কে ট্রেঞ্চ। বাড়ির সামনে বাফল-ওয়াল, বালির বস্তার ব্যূহ। জানালায় জানালায় কাগজের ফিতের জাফরি। বাড়ির ভিতরেও সরকারি হুকুমনামায় তৈরি হয়ে গেছে বোম-শেল্টার। এ আর পি-র লোকেরা নীল উর্দি পরে অষ্টপ্রহর দৌড়াদৌড়ি করে। দমকল বাহিনী ঝকঝকে গাড়ি নিয়ে তৈরি থাকে ;—"... আতঙ্কের ঘোমটা পরা রাস্তার আলো/অতিকৃত কালো কালো নৈশ জীবনের ছায়াদের ডাকে/ঘরে বাইরের জানালার ফাঁকে ফাঁকে/নিরুদ্ধ তৃষ্ণার তাই খুলে যায় খিল/চলে রণদগ্ধ জীবনের ছায়ার মিছিল/ক্ষুধার হুঙ্কারে ডোবে উন্মার্গের গান/বাঁকা টুপি পরা কোনও আমেরিকান/কাপ্তেনের লোলুপ শিস্ তরুণী রাত্রির গালে চাবুক মারে/সামরিক অশিস্ ঝরে পড়ে/বিধ্বস্ত মাথায় চালে ডালে কাপড়ে...।" মিলিটারি পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে ভিনদেশি ফৌজ এধারে ওধারে ক্ষিপ্র আমোদ সন্ধান করে বেড়ায়। ওরা দুটো মাত্র শব্দ জানে,—'বিবি' আর 'রেণ্ডি'। তা-ই খোঁজে। আর সে সব নিয়ে চট্টগ্রামে নানা কাণ্ড। কলকাতায় হয়তো সেরকম কিছু ঘটছে না, তবু আতঙ্কের শহর কলকাতা একই সঙ্গে যেন প্রমোদেরও শহর। ফিরিঙ্গি মেয়েরা 'ওয়াকাই' হয়েছেন কেউ কেউ। অন্যরা মহাযুদ্ধের অনিশ্চয়তার হাওয়ায় ভাসতে থাকেন,—'পরস্ত্রীকাতর চোখ মেলে অস্পষ্ট দেখে/মাঠের অন্ধকারে প্রেমিক ফিরিঙ্গির ভিড়...।' আর এই আজব শহরেই আজব কি আজব, স্বদেশের মানুষ ভিক্ষাপাত্র হাতে কঙ্কাল হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায়। চাল নয়, ভাত নয়, তারা শুধু ফ্যান চায়।

ইতিমধ্যে আরও একটি ঘটনা ঘটে গেছে ভারতে। ৪২-এ 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। ওদিকে দূরপ্রাচ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে আজাদ হিন্দ ফৌজ। দেশের ভেতরে যদি সমবেত ধ্বনি 'ভারত ছাড়', বিদেশে মুক্তি যোদ্ধা বাহিনীর মুখে আওয়াজ—'দিল্লি চলো।' ৪২-এর আগস্টে গান্ধিজি ডাক দিলেন। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' মন্ত্র নিয়ে শুরু হল দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন। প্রথমে ঝড়ের কেন্দ্র ছিল বোম্বাই। তারপর কলকাতা। ক্রমে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে দেশময়। দিকে দিকে ধর্মঘট, বেপরোয়া খণ্ড লড়াই। বড়লাট লিনলিথগো মনে করেন ১৮৫৭-র মহা-বিদ্রোহের পর এমন বিস্ফোরণ আর কখনও ঘটেনি। ১৯৪৩-র সালের শেষে সরকারি খতিয়ান, গ্রেফতার হয়েছিলেন, ৯১,৮৩৬ জন। ২০টি থানা, ৩৩২টি রেল স্টেশন, ৯৪৫টি ডাকঘর ধ্বংস অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে ৬৬৪টি। পুলিশ এবং মিলিটারির গুলিতে প্রাণ হারান ১০৬০ জন। বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লড়াইয়ে শহীদ হন ৬৩ জন পুলিশ কর্মী। ২১৬ জন পুলিশ বাহিনী ত্যাগ করেন। জওহরলাল নেহরু অবশ্য মনে করেন এই খতিয়ান মনগড়া। তিনি লিখেছেন, সাধারণ মতে প্রায় ২৫ হাজার লোক নিহত হয়েছিলেন। এটাকে অত্যুক্তি বলে ধরলেও কমপক্ষে যে ১০ হাজার লোক নিহত হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। '৪২-এর ভারতে সংগ্রাম এবং ত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রচিত হয় বাংলার মেদিনীপুরে। এক ভগবানপুর থানায়ই শহিদ হন সতেরো জন। অক্টোবরের মধ্যে কয়েকটি থানা বিদ্রোহীদের হাতে চলে যায়। এই অক্টোবরেই মেদিনীপুরে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস। বিস্তীর্ণ